ঘুমোনো তবু ঘুমোবে না : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কমলাকান্তের 'ঘুমোনো তবু ঘুমোবে না' - কবিতাটি কাব্য ভাবনালোকের উজ্জ্বল অনুভূতি বোধময়ের অন্যতম প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা। সর্বদা কমলাকান্ত প্রধানত নিজের অনুভবের মধ্যে ঈশ্বর — জগৎ মানবের সংশয় থেকে অন্তর্নিহিত সংশয়মুক্তির পথ খুঁজ করতে চেয়েছেন।

কবির ঘুম হয় এই আকাশের মধ্যে যে এই মানবদেহ রূপ ঘুমোনো তার সম্ভব হয় না। মনে হয়েছে হয়ত সেই শৈশবের সময় থেকেই দেহকে তাদের সাথে উন্মোচিত করেছে টানটান চলে আসছে। শৈশব নিয়েছে উদ্যত 'কেন ওঠার'। কবির ভয় হয় এই দেহটাকে ঘুমিয়ে আর স্বপ্নে দিয়ে বসা যায় না। তা ঘুমোয় যাচ্ছে। ঘুমের তাকে বলা নেই কিন্তু এই ঘুমিয়ে-যাওয়ার কারণ এখনও কিছু না — ভবিষ্যতের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আর ঘুমোয় যাচ্ছে বলেই এখন জেগে থাকার লালসায় তাকে উঠে তার দিত। 'ভয় লাগে না', 'প্রাণ দিতে না' — এ সমস্ত কথার মধ্যে কবির আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হয়েছিল তিনি নেওয়া যায়।

কিন্তু কবির মনে কোনো এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। 'বড় আশা' ছিল কবির যে 'হবে জানা এই জগতে।' কিন্তু তার পরিবর্তে কবি দেখছেন 'তবু ঘুমাতে না ঘুমোবে আমার'। কিন্তু কমলাকান্ত আশা সর্বদা আর ছাড়েন না। ফলত: নিরবচ্ছিন্ন আকাশের দিকে তার কোনো বড় হয় ওঠে- এই প্রশ্নের করেন। এবং তিনি অনুভব করেন আশা পূরণ হয় না তার কেবল 'দুইটি আগুন জ্বলে আছে।' (মনে হয়েছে যেন এই অপূর্ণ আশার আক্ষেপ সময় এতই অনুভূতি জীবনের এক মূল সুর, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন — 'আশা না পুরিল')। দুইটি আগুন যে তার বীজ তা বলে দেবার অবকাশ রাখে না, কিন্তু উল্লেখ্য যদি

ফলে হল এই যে রবীন্দ্র সম্বন্ধে জীবনানন্দের বক্তব্য ঠিক প্রচলিত মত নয়। প্রকৃত সাধক বলেই তিনি মানেন কাম ক্রোধাদি বৃত্তি বিলুপ্ত হবার যোগ্য নয়। সে সব বৃত্তি যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে তা মানুষের কল্যাণেই বৃদ্ধি করে। প্রবৃত্তি নির্মূল হলে তো সভ্যতা নিভে যেত। ক্রোধ লুপ্ত হলে প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকত না। লোভ হীন মানুষ তো উন্নতির চেষ্টা ভুলে যেত। তাই এ সম্বন্ধে জীবনানন্দের [illegible] বলেই এক্ষেত্রে তিনি 'অসুন্দর' বললেন না। অসুন্দর যেমন যতক্ষণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন তা সভ্যতাকে আলো দেয়, নিয়ন্ত্রণহীন হলে সে অসুন্দরই যেমন সর্বনাশ ডেকে আনে, ডঃ রবীন্দ্রও ঠিক তেমন। আলোচ্যমান লেখা থেকে তাই মনে হয় সেই অনুরাগে ডঃ রবীন্দ্র 'নির্ভুল' হয়েছেন অর্থাৎ নিজের পূর্ণ মুক্ত হয়েছে বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছিল তার কারণ সাহিত্যে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

এরপরেই প্রসঙ্গত চলে জীবনানন্দ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত অভিধানের উল্লেখ। তাঁর লেখা — 'জন্ম জরা মৃত্যুহর' 'তার নাম কৈবল্য ধাম'। এখানে তন্ত্র সাধনায় হয়ঃ বেদান্তের - যা সাধনার চরম রসাস্বাদে আমরা পৌঁছাই না। রসাস্বাদ ও আনন্দলাভের জন্য। তন্ত্র সাধনার 'অভিযান' প্রযুক্ত হতে দেয় = হতে হবে সিদ্ধ। সিদ্ধি লাভ করলে মানুষ জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়; সাথে সাথে [illegible] বাক্য, অমরত্ব নষ্ট না হওয়া, সুস্থ দেহ ধারণ করতে পারা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাপ্তি হয়। সুতরাং জরা ও মৃত্যুর হরণের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু সাথে সাথে তার নাম শুধু 'জন্ম' হরণেরও পথ বলা যায়। এখানে জন্ম অর্থ পুনর্জন্ম। সাধকের কামনা সর্বদা দেহাশ্রিত থেকে যাওয়া - তাই পুনর্জন্ম রোধ তার বড় তাড়না, কিন্তু সাধনার চরম এই সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়ায় আসে সাধকের কাছে এক মনোবৈকল্যের [illegible]। তার পরিবর্তে এখানে জীবনানন্দ ইন্দ্রিয়ের কাম প্রতিবাদের আত্মপ্রত্যয়ের এর 'তার' নাম মৃত্যু-ই পরিত্রাণের উপায় হয়ে উঠেছে। এখানে 'প্রেম' 'তার' কিন্তু তিনি অনন্ত চেতনা - জীবনানন্দের কাছে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের মিথ্যা মায়া নন। আমাদের ধর্মগত চিন্তার এক মূল সূত্র দিয়েছে এই ভাব। জীবনানন্দ 'তার' নাম দেননি - কিন্তু এর প্রতি উদাসীন না তো বললেন 'কৈবল্য' — ঐ শব্দটি মাত্র — সেখানকার কিভাবে আত্মনিরীক্ষণমূলক সাধনায় ইঙ্গিত আছে।